একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

'Sari Dharma Seren Puthi': From the perspective of a poetry reader:

কাব্যপাঠকের দৃষ্টিতে: 'সারি ধরম সেরেঞ পুঁথি'

Name of the Author: **Lilabati Saren**

Affiliation: **Independent Researcher, West Bengal, India**

Abstract: 'Sari Dharam Serenj Puthi' is a collection of Santali songs by Sadhu Ramchand Murmu. The book, comprising two volumes, was published by Dr. Dhirendranath Baske in 2013. Each song's title includes a reference to the traditional tune or 'raga' of Santali music. He was primarily a poet, but he is also quite renowned as a playwright. In his poetry, he attempted to capture images of nature and the prevailing trends of society and culture, while also conveying a message of breaking free from narrow confines. His songs did not become 'art for art's sake.' Although some older forms are followed in his songs, most of them express the poet's profound thoughts. Through most of his songs, he presented traditional themes in a new light. While he used traditional tunes as the ragas for his songs, these melodies were entirely his own creation. He introduced a new trend by incorporating Baul melodies into Santali songs. Just as Rabindranath Tagore, while maintaining the characteristics of Indian music, broke the orthodoxy of traditionalists and introduced a new musical style, Sadhu Ramchand also broke with conventional trends and molded Santali songs into a new form. Through the use of metaphors and symbols, his songs have become poetic. He used songs as a weapon for public awakening. He tried to bring diversity to his original compositions by incorporating traditional Santali melodies. The use of fluent language and rhythmic embellishments has made Ramchand's songs highly expressive.

Keywords: Song collection, traditional, musical style, poetic, structure, 'art for art's sake', thought, public awakening.

কাব্যপাঠকের দৃষ্টিতে: ‘সারি ধরম সেরেঞ পুঁথি’

লীলাবতী সরেন

‘সারি ধরম সেরেঞ পুঁথি ’— সাধু রামচাঁদ মুরমু-র সাঁওতালি গানের এক সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটি দুটি খন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খন্ডে ২৮টি গান এবং দ্বিতীয় খন্ডে ২২টি গান সংকলিত আছে। প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে এবং দ্বিতীয় খন্ড ১৯৭২ সালে। পরবর্তীকালে দুটি খণ্ড একত্রে প্রকাশ করেন ড. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ২০১৩ সালে। প্রতিটি গানের শিরোনামে সাঁওতালি গানের ঐতিহ্যময়ী সুর বা রাগের উল্লেখ আছে। গ্রন্থটি সাঁওতাল সমাজের মূল্যবান দলিল। সাঁওতালি গানের বহুবিচিত্র সুর যে আয়ত্ব করতে পেরেছিলেন সাধু রামচাঁদ মুরমু, তার প্রমাণ এই গ্রন্থ।

শিলদা ব্লকের কামারবাঁদী গ্রামে স্বর্গীয় সাধু রামচাঁদ মুরমু-র জন্ম। তিনি সাঁওতালদের কাছে কবিগুরু হিসেবে পরিচিত। তাঁর রচিত এই গানের মধ্য দিয়ে তিনি হাজার তারার মাঝে জ্বলজ্বল করে জেগে থাকবেন সাঁওতালদের হৃদয়ে ও মনে। তিনি মূলত কবি , তবে নাট্যকার হিসেবেও তার কম খ্যাতি নেই। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির ছবি এবং সমাজ সংস্কৃতির প্রচলিত ধারাকে যেমন ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন , তেমনি সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার বার্তাও আছে।

অধিকাংশ গানগুলি তাঁর মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও এগুলি অনেক আগেই লেখা। ১৯২৩ সালে সাঁওতালি ভাষার জন্য ‘মজ দাঁদের আঁক’ তৈরি করে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই লিপিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। তারপর সাধুবেশ ধারণ করে তিনি সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে জনজাগরণ ঘটানোর চেষ্টা করেন; অর্থাৎ এই গ্রন্থে সংকলিত গানগুলি ১৯৩০ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে লেখা। যে-সময়ে তাঁর এই গানগুলি রচিত তখন ইংরেজি সাহিত্যে ইয়েটস এলিয়টের যুগ শেষ হয়ে গেছে , বাংলা সাহিত্যে উত্তর-আধুনিক কাব্যচর্চা শুরু হয়েছে এবং বাংলা গানের জগতে অতুলপ্রসাদ সেনের ঠুংরি প্রতিষ্ঠা লাভ করে গেছে। ‘আর্ট ফর আর্টস সেক’ — শিল্পের জন্য শিল্প হয়ে উঠেনি তাঁর গান। তিনি একটা তাগিদ থেকে এই গানগুলি রচনা করেছেন।

গান— সাহিত্যের অন্যতম উপাদান। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদেও জ্ঞেয়রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। আসলে গীতিধর্মীতা যে-কোনো ভাষা-সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ বলা যায়। সাঁওতালি গানের প্রাচীনত্ব নিয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। লোককথা ছড়া ধাঁধা প্রবাদের পাশাপাশি সাঁওতালি গানের প্রাচীনত্ব নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আলোচ্য গ্রন্থের গানগুলিতে পুরানো কিছু আদল অনুসৃত হলেও বেশিরভাগ গানগুলিতে কবির গভীর ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। বেশিরভাগ গানের মধ্য দিয়ে প্রচলিত ধারাকে নতুন মোড়কে তুলে ধরেছেন।

সাঁওতালদের কিছু কিছু গান আছে, যেগুলি কোনো বিশেষ উৎসব-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গাওয়া হয়; আর কিছু কিছু গান উৎসব-অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে কেবল বিনোদনের জন্যই গাওয়া হয়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে সাঁওতালি গানকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে — আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক গান। তবে বিষয় অনুযায়ী

সাঁওতালি গান একাধিক শ্রেণিতে বিভক্ত। বিষয়বৈচিত্র্য অনুযায়ী রামচাঁদের সমগ্র গানগুলিকে কয়েকটি ধারায় ভাগ করা যেতে পারে :

১. আত্মপরিচয়মূলক : সাধু রামচাঁদ জিয়াউ, অনড়হেঁ।

২. বিনোদন মূলক: হুমটি, পরব সেরেঞ, লাগড়ে সেরেঞ, ঝিঁগা ফুলিয়া, হুমটি রীড়, লুহুরি সেরেঞ, লাঁগড়ে, লাঁগড়ে ঝিকা, খেমটা রীড়, লুহুরি ঝিকা, লুহুরি।

৩. বিবাহ কেন্দ্রিক: ইতুৎ সিন্দুর দং, দং ঝিকা, বাপ্পা সুনুম সাসাং রীড়, বাপ্পা সেরেঞ বাহুতুল্ এপেসেৎ, বাপলা অনড়হেঁ রীড় , বিদায় সেরেঞ , দং সেরেঞ , বাপ্পা চুমাড়া রীড় , চাঁদো সারহাও বাপ্পা রীড় , বারিয়াৎকওআ সেরেঞ , বাপ্পা দারাম দাঃ সেরেঞ , বাপ্লা রীড় , কানহি রীড় (বিদীয় যখাঃ) , বিদীয় সেরেঞ।

৪. কৃষিকাজ মূলক : হেড়হেৎ রীড়

৫. ধর্মীয় বিষয়ক : ডাহার সেরেঞ, দারাম দাঃ দাঁসায় রীড়, বাহা হুমটি, কারাম লাঁগড়ে, দাঁসায় সেরেঞ।

৬. উৎসবকেন্দ্রিক : সহরায় সেরেঞ, দাঁসায় রীড়, সহরায় রীড়, মাতওার সেরেঞ, সিকৌরিয়া সেরেঞ, সহরায় রীড়, সিকারিয়া রীড়, সহরায় রীড়।

৭. শিশুমনস্ক বিষয়ক: কাহনী রীড়, দুক কাহনী রীড়, রাঃ-কাহনী রীড়, কাহনী রীড়।

৮. আধ্যাত্ম বিষয়ক: ঝাড়নী রীড়।

৯. বিবিধ: দুক্ উইহার-রীড়, ঢুহা সেরেঞ (দিকু রীড়), ঢুহা সেরেঞ, লুতুর চাপো রীড়।

বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সংগীত সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা গানের একটা স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। ইউরোপীয় সংগীতের সুর-সংহতির মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা খেয়াল গানের নতুনত্ব আনলেন। অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে হিন্দি ঠুংরির সাথে বাংলা গানের ভাবমাধুর্য মিশিয়ে নতুন আদল নির্মাণ করলেন ; নজরুল ইসলাম বাংলা গানে পারসী গজলের রীতি আমদানি করলেন। লোকসংগীত ও রাগ সংগীতের ধারার উপরে ভিত্তি করে সৃষ্টি করলেন নতুন ধারা। আর সাধু রামচাঁদ সাঁওতালি চিরাচরিত সুর— দং লাঁগড়ে বাহা সহরায় প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করলেন নতুন নতুন গান , যে গানগুলির মধ্য দিয়ে জনজাগরণকে সুনিশ্চিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সনাতনপন্থীদের গোড়ামীকে ভেঙে নতুন সংগীতশৈলীর প্রবর্তন করেন , তেমনি সাধু রামচাঁদও প্রচলিত ধারাকে ভেঙ্গে নতুন ছাঁচে সাঁওতালি গানকে গড়ে তুলেছেন। সাধু রামচাঁদ ট্রেডিশনাল সুরকে গ্রহণ করে সম্পূর্ণ নতুন গান রচনা করেছেন , তবে গানের রাগ হিসেবে ট্র্যাডিশনাল সুরের উল্লেখ করলেও তার এই সুর ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি। শুধু তাই নয় , তিনি সাঁওতালি গানে বাউল সুর আরোপ করে নতুন ধারার সংযোজন করেছেন।

'সাধু রামচাঁদ জিয়ীও ' —এটি গ্রন্থের প্রথম গান। গীতিকারের আত্মবিবরণী বিধৃত আছে এই গানে। মধ্যযুগের কবিরা যেভাবে কাব্য শুরু করার আগে নিজের আত্মপরিচয় উল্লেখ করতেন, এই গ্রন্থের সূচনাতেও সাধু রামচাঁদ মুর্মু সেই আদল অনেকটাই অনুসরণ করেছেন। কেবল আত্মপরিচয় নয় 'চাঁদো' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার কথাও উল্লেখ আছে। 'চাঁদো' সেবা করলে যাবতীয় দুঃখ মোচন হয় ; তারই আশীর্বাদে এই রচনা যেন সার্থক হয় , তা উল্লেখ করেছেন তাঁর এই প্রথম গানে। গানগুলিতে সাঁওতালদের দিশা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়-

"ইঞ লেলহা, কীই কংকা আপে ঠেনেঞ নেহর,
দেবন হাতাও কোদোর কাতে চাঁদো সেবা বেওহার।
হাতাও লেখান হিরলা অঁডে মনে জিউয়ি ধিরজাঃ,
এপের হেঁডেচ্ জত চাবাঃ ধরম গেদ আরজাঃ।
দায়া কাতে নাচার হড়াঃ আঁজম কাতিঞ থুতি,
সানাম হড়াঃ আকিল রেবেৎ বেনাও এদাঞ পুঁথি।।"[১]

অর্থাৎ, আমি বোকাসোকা মানুষ , উন্মত্ত পাগল; তোমাদের কাছে আমার নিবেদন , এসো আমরা নত হয়ে গ্রহণ করি ভগবানের আশীর্বাদ। তাঁর আশীর্বাদে মনে শান্তি পাওয়া যাবে , ভুল বোঝাবুঝি ভেদাভেদ ঘুচে গিয়ে ধর্মবোধ জেগে উঠবে। দয়া করে এই অধমের কথা তোমরা শোনো, এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে ভগবানের জ্ঞানের বাণী।

কবি মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গের প্রথম দিকে সরস্বতীর বন্দনা করেছেন। তিনিও নিজের অজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বাগদেবীর ভরসায় এবং আশীর্বাদে তাঁর কাব্যসৃষ্টির সার্থকতা কামনা করেছেন।

সাঁওতালদের নিজস্ব রীতিতে সবকিছু চললেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'দিকু'দের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সাঁওতাল সমাজেও সম্প্রতি দেখা যায় , পঞ্জিকা দেখে বিবাহের দিনক্ষণ ঠিক হয় , লগ্ন দেখে সিন্দুর দানও হয়। কিন্তু সাঁওতাল সমাজে লগ্ন-রাশি তথা সিঁদুরদান অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে। তা সাধু রামচাঁদের গানে বিধৃত—

"বেড়ায় রাকাপ্ কান জিরি হিরি,
পুবাৎ সাদমরে যুগের তিরি।
সারজম সাকামরে কিয়া সিন্দুর,
লাঠা আদিঞায় আঁদুর মাঁদুর।"[২]

সাঁওতালদের বিবাহের একটাই লগ্ন — সূর্যোদয়ের মুহূর্ত। উল্লিখিত গানের কলিতে তারই ছবি ধরা পড়েছে — সূর্য ওঠে আকাশ রাঙিয়ে, তেজী ঘোড়ায় যুগের সাথী, শাল পাতায় শুভ সিঁদুর; কপালে লেপিয়ে দিল তাড়াহুড়ো করে।

সাধু রামচাঁদের বিখ্যাত গান 'ঢুয়া সেরেঞ' আদিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। এই গানের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। সমস্যা থেকে উত্তরণের কথাও আছে। স্বাধীনতার এতবছর পরেও আদিবাসীরা নানাদিক থেকে বঞ্চিত প্রতারিত; তাদের বঞ্চনা ও প্রতারণার মূলে যে কিছু দিকুরা জড়িত , আজ তা প্রমাণিত। আদিবাসীদের যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দরকার আছে তা সাধু রামচাঁদ উপলব্ধি করেছিলেন অনেক আগে। তাই তাঁর প্রতিটি গানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একপথে সামিল হওয়ার বার্তা আছে।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভবিষ্যতে আদিবাসীদের ধর্ম-সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। তাই-তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আদিবাসীদের ধর্ম এখনও সংবিধান স্বীকৃত নয়। আলোচ্য গ্রন্থের শিরোনাম-সহ কয়েকটি গানে 'সারি ধরম' উল্লেখ থাকায় বেশকিছু সাঁওতাল ধর্মনাম নিয়ে একটা আশার আলো দেখতে পান। 'সারি ধরম'-এর প্রতিষ্ঠায় তাঁরা এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। 'সারি' অর্থে বাস্তব, সত্য, আর 'ধরম' অর্থে সঠিক। 'ধরম ধরম রড়মে' (সঠিক কথা বলো), 'ধরম ডাহার তে তাড়াম মে (সঠিক পথে চলো)। 'সারি ধরম' অর্থে সত্যই সঠিক , বাস্তববোধই সঠিক পথের দিশারী।

গ্রন্থের শিরোনাম 'সারি ধরম সেরেঞ পুথি ' হলেও তিনি 'সারি ধরম' শব্দটা গ্রন্থে খুব বেশিবার ব্যবহার করেননি— মাত্র কয়েক জায়গায় উল্লেখ পাওয়া যায়।

১) "গটা ধারতি টাপাত্তাবম্,
সারি ধরম ছাড়াওবন্।
মাবন্ তেঁগোন্ জাহের বুটারে,
মারাং বুরু মাবন সাবেয়া,
সুক্ সুলুক্ মাবন্ চাপেয়া।।"[৩]

২) "মারাং বুরু ধরম সারি,
সাবঃ আবন্ অনা তারি,
সারি সারজম সারি গাড়িম,
আমদ সৃজন জাহের সাড়িম।"[৪]

৩) "ধরম তাবন্ সারি হিল্লা,
আবন রেয়াঃ জিউয়ি পাল্লা,
নওআ তেগে নরক এড়াঃ
রেগেঃচ্ রুওয়া যত ছাড়াঃ।"[৫]

৪) "দেলা, দেলা বয়হা জোমেলতে
সারি ধরম গয়নতে

জয়, জয় মেন্তে।”[৬]

ধর্ম অর্থে বা ধর্মনাম অর্থে এই গ্রন্থের নামকরণ যতটা না ব্যঞ্জনাময় ; তার থেকে অনেক বেশি সত্যের পথ অর্থে ব্যঞ্জিত। তিনি আদিবাসীদেরকে প্রকৃতির সত্তা হিসেবে দেখেছেন , প্রকৃতির মতই তারা সহজ সরল। আদিবাসীরা প্রকৃতির পূজারী তাদের চলার পথ যে সত্য, এই সত্যপথের ইঙ্গিত হিসেবে ‘সারি ধরম’-এর ব্যবহার সার্থক বলে মনে হয়।

সাঁওতালিতে কোনো নির্দিষ্ট গানের নামের পরিপ্রেক্ষিতে সেই নির্দিষ্ট নাচকেও ইঙ্গিত করে। হুমটি একপ্রকার লাঁগড়ে গানেরই বিভাগ। সাধারণত লাঁগড়ে শেষ করার আগে হুমটি নাচ হয়। দ্রুতগতির নাচ। এই নাচেরই দ্রুতলয়ের গান হুমটি। কেউ কেউ বলেন এটি রাস্তার গান , রাস্তায় যেতে যেতে হুমটি নাচ হয়। আবার অনেকে বলেন ‘হুমটাও’ (তুড়ি মেরে) থেকে এ ধরনের নামকরণ। শুধু লাঁগড়ে নয়, বাহা সহরায়-এর ক্ষেত্রেও এ ধরনের নাচ হয়।

‘ঝিকো-ঝকো’ থেকে নাকি ঝিকী গানের উদ্ভব অর্থাৎ ক্লান্তি ভরা শরীর নিয়ে যে নাচ। তবে সাধারণত এই গানের তালে দ্রুতগতিতে নাচা হয়। কেউ কেউ বলেন ‘ঝিকনাও আতে এনেচ গে ঝিকী দ ’ (ছন্দবদ্ধভাবে টানা-হেঁচড়া করে নাচাই হল ঝিকী)। জীবনদর্শনের প্রভাব প্রতিফলিত এই নাচে — ক্লান্তিহীনভাবে জীবনকে টেনে নিয়ে যেতে হবে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। অনেক বাধা-বিপত্তি দুর্গম পথ অতিক্রম করে মানব সভ্যতা আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। উচ্চাকাঙ্খা মানুষকে স্বার্থপর করে তুলেছে , পাওয়ার নেশায় মানুষ অমানবিক হয়ে ওঠেছে। তাদেরকে ধর্মবোধ জাগানোর জন্য উদার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন গীতিকার সাধু রামচাঁদ—

সেরমা ঞুম্ জংতে জিউয়ি রীসকাঃ,
নরগ্ ঞুম্ জংতে কড়াম্ ধাসকা।
ধরম বিচাররে আলম্ দায়ো,
নরগ চালাঃদ বাংগে হোয়ো।।[৭]

অর্থাৎ, আকাশ নাম শুনলে প্রাণ ভরে ওঠে , নরকের নাম শুনলে বুকে ধড়পড়ানি ওঠে , ধর্মের বিচারে পিছোপা হইয়ো না; তাহলে নরকে আর যেতে হবে না।

কাহনি রীড়— কাহিনির মাঝে মাঝে যে গান ছড়ার আকারে পরিবেশিত হয় , মূলত এই সুর শিশুদের জন্য। কাহিনি বলার মাঝেই কাহিনিকে আকর্ষণীয় করার জন্যই নাকি গান বা ছড়ার সংযোজন। পরিবারের সদস্যদের সবার কাজ সমান নয়। তবে পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের গুরুত্ব অনিবার্য। আবাল বৃদ্ধবণিতা কেউ কম নয়। খেটে খাওয়া বেশিরভাগ সাঁওতাল , সারাদিন পরিশ্রম করার পর নিজের খাবার নিজেকেই জোগাড় করে নিজেকেই রান্না করতে হয়। বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে শিশুরাও দাদু-ঠাকুমাকে ফাঁকি দিয়ে খেলার কাজে ব্যস্ত থাকে; তাই সন্ধ্যা নামতে না নামতেই তাদের ঝিমুনি চলে আসে। না খেয়ে নাতি-নাতনিরা ঘুমাবে এ-তো আর হয়

না! তাই দাদু-ঠাকুমাদের কাজ হল , ছলে-বলে-কৌশলে রূপকথার কাহিনি শুনিয়ে তাদেরকে জাগিয়ে রাখা — যতক্ষণ না পর্যন্ত রান্নাবান্না হচ্ছে। তাই কাহিনিকে আকর্ষণীয় করা চাই। আকর্ষণীয় করতে তারা কখনো কাহিনির মাঝে 'কাহিনি রীড়' অর্থাৎ ছেলে ভুলানো সুরে গান গায়। সাধু রামচাঁদ ছেলেভুলানো ছড়ার ছন্দে গুরুগম্ভীর বিষয়েকে তুলে ধরেছেন -

"ভোর তেগে কৌমি তেদো,-রুওয়ীড়তে হোয়ো কেদো।
ভর কৌমি আষাড় বঙ্গা—বাং বাতাঃ হড়ম লাঙ্গা।।

বাসিয়াম রে দাকা জমাঃ- তিমিন্ রেচ হোয়ো মাজান।
সিয়ঃ আড়াঃ উরিচ গুপি গুতি-কড়াক্ গুগুই ছুপি।।"[৮]

গানে কৃষক সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। ভোর থেকে কাজে বেরোতে হয় তবেই তো ঘরে ফেরা সম্ভব ; ভোর থেকে উঠে কাজ করলে আষাঢ়ের বর্ষাতেও ক্লান্ত হয় না পা। সকাল বেলার খাওয়া , দুপুরে মিলবে কিনা সন্দেহ! হাল ছেড়ে হাঁফ ছাড়ে চাষী, রাখাল গরু চরায় আর পুরুষেরা বয় 'ছুপি'।

শিশু মনস্ক বিষয়ক ছেলেভুলানো ছড়ার সুরে গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করে সাধু রামচাঁদ আদিবাসীদের সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন যুক্তিবাদীর পাশাপাশি ধর্মভীরু না হলে মানুষের মানবিক বোধ জাগে না , ঐক্যবদ্ধ হওয়াও মুশকিল। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি ও ধর্ম আছে ; প্রত্যেক জাতিরই উচিত তাদের সংস্কৃতি ও ধর্মকে ধরে রাখা। তাই ছড়ার সুরে বেদনাকে জাগিয়ে সাঁওতালদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও ঐক্যবদ্ধের বার্তা দিয়েছেন -

"দহয়াবন চাঁদো মাহিমান,
ফারচায়াবন জিউয়ি ঠান মান
উদুগাবন ভায়া চারি।।

দে দেলাবন হাকো পাকো,
আয়ো বাবা দাই দাদা ক
গয়ন পে নারি ঠুরি।।"[৯]

ধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁর নির্দেশ — সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা রাখব সরল মনে , কোনো জটিলতার ঠাঁই দেব না , সকলের প্রতি আমাদের সৌহার্দ্য থাকবে। এসো এসো সবাই তাড়াতাড়ি , মা বাবা ভাই দাদা সবাই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার করি।

চুমাড়া রীড় : আশীর্বাদের জন্য এই গান গাওয়া হয় ; ঐতিহ্য অনুযায়ী এই গান গাওয়ার বিশেষ রীতি ও মুহূর্ত আছে। থালায় আতপ চাল, দুর্বাঘাস এবং মাটির প্রদীপ রেখে বিশেষ পদ্ধতিতে শুদ্ধিকরণ করা হয়। কেবল

এই সময়ই 'চুমাড়া গান' গাওয়া হয়। সাধু রামচাঁদ সুরের এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।

'ডাহার' — রাস্তায় যাওয়ার নাচ , হুমটির সাথে অনেক মিল আছে। 'ডাহার' শব্দের অর্থ পথ। 'বাহা উৎসবে'র একটি অনিবার্য অঙ্গ হল 'ডাহার'। কেউ বলেন এটি রাস্তা পরিষ্কারের নাচ। সাঁওতালরা বাহা উৎসবের আগেরদিন রাত্রে দেব-দেবীদের ডাকা হয় ; তাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া হয় পথের সংবাদ , কোথাও কোনো বাধা-বিপত্তি আছে কিনা। মূলত ধর্মীয় গানের সুরে সমাজের উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করার ডাক দিয়েছেন রামচাঁদ তাঁর 'ডাহার' গানের মধ্যদিয়ে।

ঝিঁগা ফুলিয়া: লাঁগড়েরই একটা ভাগ। রূপক অর্থে এই গান গাওয়া হয়। ঝিঁগা ফুল সন্ধ্যাবেলায় ফোটে , দিনের বেলায় সাধারণত ফোটে না। এমন কিছু গান আছে , যে গানগুলি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া হয়। গানের ভাষা সাবলীল হলেও শব্দপ্রয়োগের চাতুর্যে এই গানকে বিশেষত্ব দান করে। প্রতীক বা রূপকের আড়ালে মূল অর্থকে ঢেকে বিশেষ সুরে এই গান গাওয়া হয়। সাধু রামচাঁদ মুরমু-র এই শ্রেণির গানগুলি অসাধারণ কাব্যমহিমায় মণ্ডিত। বিষয়গত দিক থেকে ঝিঙ্গা ফুলিয়া সাথে 'খেমটা'র সাদৃশ্য আছে। কেউ বলেন 'ঝিঙা ফুলিয়া'র ভিন্ন নাম তথা উৎস হল 'খেমটা'। 'লুহুরি'– লাঁগড়েরই একটা ভাগ। সাংসারিক জীবন যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই গানের মধ্য দিয়ে।

'ঢুয়া': এর বিশেষত্ব হল শ্লোকধর্মিতা। এই গানের মধ্যদিয়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার ডাক দিয়েছিলেন সাধু রামচাঁদ। নিঁখুত বিচারে বাউল-এর প্রভাব আছে তাঁর এই শ্রেণির গানগুলিতে। তবে বিদ্রোহের বার্তাকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন।

'মাতওয়ার': সহরায় উৎসবের সময় এই গান গাওয়া হয়। গরুকে কেন্দ্র করে পালিত হলেও এই উৎসবে গ্রামের মানুষের সাথে সামিল হয় আত্মীয়স্বজনও। গরু খুঁটানোর পর আনন্দে মাতোয়ারা হয় তারা। 'লাঁগড়ে' শুরুর প্রাক পর্ব হল মাতওয়ার। আবেগ-আপ্লুত এবং শ্লীল-অশ্লীলতাও ফুটে উঠে এই গানের ভাষায়। ক্লান্তি হরণের আশায় 'লাঁগড়ে' নাচের আসর বসে। অর্থাৎ সহরায় এবং লাঁগড়ের সংযোগসেতু হচ্ছে মাতওয়ার।

'পরব সেরেঞ' হল ভ্রমণমূলক গান। বিভিন্ন জায়গায় , বিভিন্ন মেলা-পরব উৎসবে জমায়েত হওয়ার পর আনন্দ-বিনোদনের জন্য এই গান গাওয়া হয়। এর সুরও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হারিয়ে যাওয়া মানুষকে নিয়ে হাহাকার কিংবা প্রেম-বিরহের বেদনা এই গানের সুরে ধরা থাকে। একটা পরব সেরেঞ-এ পাই:

"হোলোদ পুখুর কাল্কা পিড়,
কুড়ি কড়া হিপিড়ে হিপিড়।
বাদম্ পাতকম্ ইচাঃ পিড়, কুচুং,
বয়হা মিদুঃ পেসে কংকা ভুচুং।।"[১০]

(হলুদ পুকুরের পাড়ে, পুরুষ মহিলাদের জমজমাট সমাগম , কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি মন দেওয়া-নেওয়া হয় ; পাগল ভাই, এই সুযোগে জোট বাঁধো সবাই।) হলুদ শব্দটি আনন্দ , শক্তি এবং প্রজ্ঞার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রেমের প্রতীক হিসাবে 'হলুদ' শব্দের ব্যাবহার অনেক কবি করেছেন। আলোচ্য গানে 'হোলোদ পুখুর' বিনোদনের আখড়া হিসাবে ব্যঞ্জিত। এই বিনোদনের আখড়াকে কাজে লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন সাধু রামচাঁদ। বিভিন্ন মেলা পরবে কেবল সাঁওতালরা যে জড়ো হয় , তা নয়; নানা জাতি নানা ভাষাভাষি মানুষেরাও সামিল হয়। সবার বোধগম্য করে তোলার জন্য গানের ভাষাতেও প্রতিবেশি ভাষার প্রভাব পড়েছে।

হাটে বাটে মাঠে — সর্বত্রই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ; কর্মক্ষেত্রে তীর্থক্ষেত্রে ক্ষেতখামারে সর্বত্রই আনন্দ খুঁজে পেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বলেছিলেন 'আমরা চাষ করি আনন্দে/ মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে॥'[১১] কাজের মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে তাহলে সেই কাজে মনোযোগ আসে না ; ফলে সাফল্যও আসে না সহজে। বেশিরভাগ সাঁওতাল চাষবাস করেই জীবিকা নির্বাহ করে। একঘেয়েমি দূর করার জন্য গান করতে করতে কাজ করে তারা। কাজ অনুযায়ী সুরও পালটে যায় ; তাই কৃষি বিষয়ক বিশেষ সুর 'হেড়েৎ রীড়'। হালচালনা থেকে শুরু করে বীজ বোনা , রোপন, ফসল কাটা ঝাড়া মাড়াই পর্যন্ত সাঁওতালরা দলবদ্ধভাবে কাজ করে। কৃষিকাজের বিশেষ এক পর্ব 'হেড়েৎ'— এর অর্থ আগাছা পরিষ্কার করা। ধানক্ষেতে আগাছা পরিষ্কারের সময় মহিলারা গান গায় , জীবনের কথা প্রকৃতি জীবজগতের কথা উঠে আসে এই গানের মধ্য দিয়ে। সাধু রামচাঁদের এই গানে ধরা পড়েছে বিশেষ বার্তা —

"ধরম বুদ ইমাঞ বিন
নাসাঃ খন্ তরাও কাঞবিন
নিয়া ধাও ইকা কাঞবিন্
পারাংগত ডাহার ঠিকাঞ বিন।"[১২]

অর্থাৎ ধর্মবোধ যেন আমার জেগে উঠে , অধঃপতন থেকে রক্ষা করো আমায় , এবারের মতো ক্ষমা করো। মুক্তির পথের সন্ধান দাও। ভগবানের কাছে তার এই আবেদন তাঁকে 'সারি ধরম' তথা সত্যপথের দিশারি করে তুলেছে।

সাঁওতালি গানের একটি বিশেষ রাগ হল 'অনড়হেঁ' —যার আক্ষরিক অর্থ কবিতা , আরেক অর্থ স্তুতি বা বন্দনা। 'অনড়হেঁ' শীর্ষক গানে স্তুতি কিংবা বন্দনার কোনো নমুনা নেই। অনুপ্রাস অলংকারের প্রাচুর্যে সুরমাধুর্য বৃদ্ধি করেছে। একই বর্ণের শব্দ দিয়ে পুরো পংক্তি নির্মিত –

"দে দেলা দাই, দাদা, দেবন দাড়া দিড়ি দিড়ি।
দিল দাড়ে দৌড়তে দেশ্ দবন দখলা।।
বাইরি বনে বেবেবনা ববর বারাক বেরবন।

বির বিরাদ বয়হাক্ বেরেৎ বেরেৎপে।।"[১৩]

(এসো সবাই দাদা দিদি সবাই মিলে রুখে দাঁড়াই , ক্ষমতা বলে আমারা দেশকে রক্ষা করি ; শত্রুরা জেগে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াই, বিদ্রোহী ভাইয়েরা জেগে ওঠো সকলেই।) দেশ তথা মাতৃভূমি তো মায়ের তুল্য ; তার জয়গান না গাইলে তাকে রক্ষা করা তো সম্ভব নয়।

'দারাম দাঃ দাঁশায় রৌড়' — অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ। সাঁওতালি গানের ধারায় একেবারেই নতুন সংযোজন। দারাম দাঃ কথাটি সাধারণত বিবাহ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রচলিত। সিঁদুর দানের আগে বরযাত্রীদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর এক কৌশল। গ্রামের প্রান্তসীমা থেকে বাদ্যযন্ত্র সহকারে নাচগান করতে করতে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা জানানোর নামই হচ্ছে 'দারাম দাঃ'। সাধারণত এই সময়ের গানের সুর 'বাপলা রৌড়'। অবশ্য বিবাহ-অনুষ্ঠান ছাড়াও অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানেও 'দারাম দাঃ' প্রচলিত। অন্যদিকে 'দাঁশায়' হল ধর্মগুরুদের ভ্রমণযাত্রা, অন্বেষণই হল এ যাত্রার উদ্দেশ্য। এই গানে দুঃখের ছোঁয়া স্পষ্ট ; আর 'দারাম দাঃ' যেহেতু মিলনের বার্তা বহন করে ; তাই দুঃখের মধ্যেও আনন্দ ছোঁয়ার চেষ্টা কিংবা এই আনন্দের মধ্যেও দুঃখের সুর আরোপ করে একটা সহানুভূতি আদায় করার চেষ্টা করেছেন সাধু রামচাঁদ–

"সোতোঃ সুমুং জিউয়ি তালে আলে লেলহা আডি নিসারতি,
মেনাঃ লেয়াঃ আপে রেয়াঃ উমুল্ রেগে,
দায়া কাতে মান্দ্রা আলেপে।"[১৪]

ছা-পোষা জীবনের সারল্যই ফুটে উঠেছে উদ্ধৃত গানে — মুঠোখানেক প্রাণ মোদের, হাঁদাভোঁদা মোরা বুঝি না কিছু; আমরা আছি তোমাদেরই ছায়াতলে; দয়া করে আশীর্বাদ করো।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর রচিত এই গান। স্বাধীনতা-উত্তর দেশভাগ দাঙ্গা এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পড়েছিল সমগ্র জনমানসে। রাজা আসে রাজা যায় ; আর সচেতন বুদ্ধিজীবীরা অনুভব করতে পারেন জনগনের তাতে কিছু যায় আসে না। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন — 'এই রাজা আসে ওই রাজা যায়/জামা কাপড়ের রং বদলায়/দিন বদলায় না!...সব ঝুট হায়! সব ঝুট হায়। ..."[১৫] তবুও তো রাজার উপরে নির্ভর করতে হয় সাধারণ জনগণকে; রাজাকে তারা যথাসময়ে তার রাজস্ব প্রদান করে ; বিনিময়ে প্রজাদের প্রাপ্য রাজার মলিন পায়ের ধুলো। ব্যঙ্গ করে তাই সাধু রামচাঁদও বলেছেন :

"দুলাড়িয়া-রাজ সাহেব এগো বাবা জহার জহার,
মনে রেয়াড় জিউয়ি সাগেন জাঙ্গা ধুড়ি,
কদোর কাতে নডেম কটা কেৎ।"[১৬]

(প্রাণাধিক প্রিয় রাজা সাহেব তুমি পিতার তুল্য , নমস্কার জানাই তোমায়। শান্ত মনে প্রস্ফুটিত প্রাণে পায়ের ধুলো উজাড় করে ঝেড়ে দিলে এখানে।)

বঞ্চিত প্রতারিত মন হাহাকার করে উঠেছে দাঁশায় সেরেঞ-এ । আদিবাসী সাঁওতাল যুগ যুগ ধরে প্রতারিত শোষিত হয়ে আসছে, তা সাধু রামচাঁদ মুর্মু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন অনেক আগেই। নিজের শক্তি দিয়ে যখন প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করা যায় না, তখন অলৌকিক শক্তির কল্পনা করে সুখ ও শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করে মানুষ। সাধু রামচাঁদ দুর্দশার ঘোরে বিভোর থেকেও এক ধাপ এগিয়ে সত্য-শিব-সুন্দরের স্বপ্ন দেখলেন দাঁশায় গানের মধ্য দিয়ে–

"গুরু হো জাঙ্গা ধুড়ি কটা কেদাম্
আলে রেয়াঃ মনে জিউয়ি ত্রিপিত্ কেদাম্
চাঁদো রেনাঃ দায়া সেটেরেন।

... ...

দেন গো বাবা দুলাড় দাঃদ জাড়ি মেসে
মাগো বাবা দায়া ঝারনা লিঁজি মেসে
আলে রেয়াঃ জিউয়ি রেয়াড় মে।"[১৭]

(গুরু হে পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেললে , আমাদের অন্তর-প্রাণ পরিতৃপ্ত হল; ভগবানের আশীর্বাদ পেলাম।... অনুগ্রহ করে কৃপা-সুতা ছিন্ন করো না, প্রেম-ছায়া সরিয়ো না, গুরু হে আমাদের জীবদ্দশায়।)

সাঁওতাল সমাজ আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে ভরপুর; তৎকালীন সাঁওতাল সমাজের মানুষেরা দেখে এসেছেন ওঝার জুড়িবটি ব্যর্থ হলে গুনিনের ঝাড়ফুঁক , তুকতাক ও মন্ত্রতন্ত্রই সম্বল ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে ঝাড়ফুঁক করেই দুরারোগ্য থেকে মুক্তি পেয়েছে অসংখ্য মানুষ। আসলে আত্মবিশ্বাসটাই আসল কথা। কখনো কখনো ঝার্ণী সুরে (ঝারনি রীড়) গান গেয়ে অশুভ আত্মাকে শরীর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মন্ত্রের সুর , মূলত ঝাড়ফুক থেকে এই সুরের আমদানি। দেবদেবীদের তুষ্ট করার জন্য এই গানের সুর। এই সম্মোহনী সুরে সাঁওতালদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি গাইলেন -

"দুক্ জালা জিউয়ি লাঁগা,
সহদ মে চাঁদো বঁগা,
আলে জিউয়ি তরাও মেসে আমাঃ দায়া তেগে চং।।"[১৮]

(দুঃখ যন্ত্রনায় ক্লান্ত প্রাণ, আশীর্বাদ দাও ভগবান, আমাদের জীবন-তরনী পার করে দাও তোমার কৃপায়)।

গীতিকবিতা বা ব্যালাডস তার নির্দিষ্ট সীমা থেকে সরে এলেও এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের মত হল:

"It is a loose usage which permits scholars to use the word in the sense both of dance song and of lyrical narrative, in the same work; the ambiguity is unnecessary. If ballad means something like dance song, or choral dance, or folk-

dance accompanied by improvisation and refrain, the term ballad-dance is tautological; for all ballads involve dancing. One wishes for more precision. But this need not detain us here."[১৯]

ওয়ার্ডসওয়ার্থ গীতিকবিদের বিশেষ এক অবস্থার কথা বলেছেন , 'Emotion recollected in tranquility' — এই অবস্থায় তাদের আবেগ সংযত ও সংহত হয়ে গাঢ়ত্ব লাভ করে। সাধু রামঁচাঁদের মধ্যেও এই আবেগ কাজ করেছে। ভাষার ঐশ্বর্যে , ছন্দের ঝঙ্কারে এবং ভাবের গভীরতায় তাঁর গানগুলি মনোহারী হয়ে ওঠেছে। ইংরেজি এলিজাবেথীয় সাহিত্যের প্রায় সবকটি বিভাগে গানের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত লাভ করেছে। নাট্যকার মাত্রই সংগীতের অনুরাগী হন; সাধু রামচাঁদ বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন , তাঁর গান তাই কাব্য হিসেবেও উপভোগ্য। রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারে তাঁর গান হয়ে উঠেছে কাব্যধর্মী। কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষকে যতটা না সচেতন করা যায় , তার থেকে গানের মধ্য দিয়ে অনেক সহজে মানুষের হৃদয়কে জয় করা যায়। তাই গানকে তিনি জনজাগরণের অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন। গানের সুরটাই আসল। নিজস্ব সৃষ্টি গানগুলিতে ঐতিহ্যময়ী সাঁওতালি সুর আরোপ করে বিচিত্রতা দান করার চেষ্টা করেছেন।

প্রতিটি গানের মাথায় রাগ ও সুরের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের অধিকাংশ গান সংক্ষিপ্ত , কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি গানগুলি রচনা করেছেন। সাবলীল শব্দ ব্যাবহার , ছন্দ অলংকারের প্রয়োগে রামচাঁদের গানগুলি হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাময়ী। তাঁর গানে আবেগপূর্ণ গল্প বা প্লট নেই ঠিকই ; তবে গানের প্রতিটি কলিতে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে নাটকীয় মূর্ছনায়। ফলত অনায়াসেই কবির মনোজগতের সাথে পাঠকের সংযোগ ঘটে। তাই এই গ্রন্থখানি গীতিকাব্যের সংকলন বললেও ভুল হবে না।

তথ্যসূত্র:

১. মুরমু, সাধু রামচাঁদ, সাধু রামচাঁদ জিয়াউ, 'সারি ধরম সেরেঞ পুঁথি', মার্শাল বাম্বের, ঝাড়গ্রাম, ২০১৩, পৃঃ ৪
২. তদেব, পৃঃ ৫
৩. তদেব, পৃঃ ১৪
৪. তদেব, পৃঃ ২৫
৫. তদেব, পৃঃ ৩৮
৬. তদেব, পৃঃ ৫০
৭. তদেব, পৃঃ ১০
৮. তদেব, পৃঃ ১৩
৯. তদেব, পৃঃ ২৬
১০. তদেব, পৃঃ ৬
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৩০ সংখ্যক গান, বিচিত্রা, গীতবিতান (অখণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা-১৭, আশ্বিন ১৩৭১, পৃঃ ৬০১

১২. ঠাকুর, সাধু রামচাঁদ, হেড়েৎ রীড়, সারি ধরম সেরেঞ পুঁথি, মার্শাল বাম্বের, ঝাড়গ্রাম, আশ্বিন ২০১৩, পৃঃ ৫৬
১৩. তদেব, পৃঃ ৬
১৪. তদেব, পৃঃ ২৫
১৫. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, রাজা আসে যায়, নির্বাচিত কবিতা, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, কল-৭৩, ১৯৬০, পৃঃ ৯০
১৬. ঠাকুর, সাধু রামচাঁদ, হেড়েৎ রীড়, সারি ধরম সেরেঞ পুঁথি, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫
১৭. তদেব, পৃঃ ৪৭-৪৮
১৮. তদেব, পৃঃ ১৮
১৯. POUND, LOUISE, POETIC ORIGINS AND THE BALLAD, THE MACMILLAN COMPANY, New York, NOTTINGHAM, 1921, p.28